❑ প্রথম পরিচ্ছেদ ❑

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু, প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্যকলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে, "ঐ রে বাধিয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ, যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্ব দিকে সূর্য

উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনোরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা একাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়ছড়, খড়খড় শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরঞ্চ ঘরে যে দিন কোনো শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থম্‌থম্ ছম্‌ছম্ করিতেছে, সে দিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কী হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে দুই ভাই যখন জল খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল স্তব্ধ গৃহ গম্‌গম্ করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় এক-পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারি দিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারি দিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলো অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্‌বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়া বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমনকি, ভাঙনের ধরে দুই-চারিটা আম-কাঁঠাল গাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বনে আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ও পারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে—উচিতমত পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে—আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রু-বর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে; আর বড়ো জা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল; তাহার দেড় বৎসরের ছোটো ছেলেটি কাঁদিতেছিল। দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল, উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, "ভাত দে।"

বড়োবউ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মতো এক মুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিল। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে, গৃহিণীর রুক্ষ বচন, বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, 'কী বললি!' বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল। এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে "কী হল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতনপক্ষ ধান কাটিতে গিয়াছিল। তাহারা পাঁচ-সাতজনে এক-একটি ছোটো নৌকায় এ পারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই-চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্কা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁদে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরিদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই অন্ধকার দাওয়ার দুই-চারিটা অন্ধকার মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিলাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখি, আছিস নাকি।"

দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্ত দিনই চীৎকার শুনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এ সে মনেও করে নাই। ফস্ করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্রবর্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সেজন্য দুখি কাঁদে কেন রে।"

ছিদাম দেখিল, আর রক্ষা হয় না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়বউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর-কোনো বিপদ থাকিতে পারে, এ কথা সহজে মনে হয় না। ছিলাম তখন ভাবিতেছিল, 'ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব।' মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর জোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "অ্যাঁ! বলিস কী! মরে নাই তো!"

ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে।" বলিয়া চক্রবর্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, 'রাম রাম! সন্ধ্যাবেলায় এ কী বিপদেই পড়িলাম। আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে!' ছিদাম কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িল না; কহিল, "দাদাঠাকুর, এখন আমার বউকে বাঁচাইবার কী উপায় করি।"

মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "দেখ্, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনই থানায় ছুটিয়া যা—বল্ গে তোর বড়ো ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।"

ছিদামের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল; উঠিয়া কহিল, "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" কিন্তু যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ-সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্তী ও কথাটা যুক্তিসংগত বোধ করিলেন; "তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব।"

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হুহুঃ শব্দে পুলিস আসিয়া পড়িল। অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল।

❑ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ❑

ছিদাম ভাবিল যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্তীর কাছে নিজমুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, সে কথা গাঁ সুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে; এখন আবার আর-একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল, কোনোমতে সে কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "যাহা বলিতেছি তাই কর্, তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।"

আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দরার বয়স সতেরো আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল; শরীরটি অনতিদীর্ঘ; আঁটসাঁট; সুখসবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে চলিতে-ফিরিতে নড়িতে-চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল আছে; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভালোবাসে, এবং কুম্ভ কক্ষে ঘাটে যাইতে-আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা-কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক ইহার উল্‌টা; অত্যন্ত এলোমেলো, ঢিলেঢালা, অগোছালো। মাথায় কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটো জা তাহাকে অধিক কিছু কথা

বলিত না, মৃদুস্বরে দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ-হাউ দাউ-দাউ করিয়া রাগিয়া মাগিয়া ঝকিয়া-ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই জুড়ি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের— হাড়গুলা খুব চওড়া, নাসিকা খর্ব, দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোরূপ প্রশ্ন করিতেও চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহু যত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্য-বর্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চ পাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কঞ্চি কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে—বেশভূষা সাজসজ্জায় বিলক্ষণ একটু যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যেদে প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহার যথেষ্ট ছিল—তবু ছিদাম তাহার যুবতি স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর-একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত, চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই; আর চন্দরা মনে করিত, আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্বে হইতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল, তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন-কি দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন কালি মিশাইয়া দিল। কাজে-কর্মে কোথাও এক দণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভর্ৎসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে, উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি, ও কোন্‌দিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।"

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "কেন দিদি, তোমার এত ভয় কিসের।" এই—দুই জায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, "এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস, তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।"

চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম এক লম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুড়িয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহু কষ্টে অনেক সাধ্যসাধনার তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল, এক-অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর-কোনো জবানবন্দি করিল না, কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার মতো বিষম টনটনে হইয়া উঠিল। এমনকি, এক-একবার মনে হইত, এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি। মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষা হয় যমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, "তোমার কিছু ভয় নাই।" বলিয়া পুলিসের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কী বলিতে হইবে বার বার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে-সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দরায় উপর দোষারোপ করিতে বলিল, "তাহা হইলে বউমার কী হইবে।"

ছিদাম কহিল, "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।" বৃহৎকার দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

❑ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ❑

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, "তুই বলিস, বড়ো জা আমাকে বটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে।" এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে যে অলংকার এবং প্রমাণ-প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিতভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড়ো জাকে খুন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিস যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল চন্দরা কহিল, "হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।"

"কেন খুন করিয়াছে।"

"আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।"

"কোনো বচসা হইয়াছিল?"

"না।"

"সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল?"

"না।"

"তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল?"

"না।"

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "উনি ঠিক কথা বলিতেছেন দা। বড়োবউ প্রথমে—"

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সেই একই উত্তর পাইল— বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে,

কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদারুণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, 'আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।'

বন্দিনী হইয়া চন্দরা একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ চির-পরিচিত গ্রামের পথ দিয়া রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্তে দিয়া মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং ইস্কুল-ঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া, কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এক-পাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সই-সাঙাতরা, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু, সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া জোড়হস্তে-কহিল, "দোহাই হুজুর আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নাই।" হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী রামলোচন কহিল, "খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'বউকে কি করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন।' আমি ভালো মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, 'আমি যদি বলি, আমার বড়ো ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।' আমি কহিলাম, 'খবর্দার হারামজাদা, আদালতে এক-বর্ণও মিথ্যা বলিস না—এতবড়ো মহাপাপ আর নাই।' " ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলো গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ভাবিল, 'ওরে বাপ রে, শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যের দায় পড়িব। যেটুকু জানি সেইটুকু বলা ভালো।' এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্দরাকে সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্তী মুন্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাদ্‌বর্তী একটি ডোবার অংশবিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে এবং তদুপলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশজন সাক্ষী উপস্থিতঠ আছে। কত শত লোক আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত তদপেক্ষা গুরুতর আর-কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে। সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউন্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, "ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কত বার করিয়া বলিব।"

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছে তাহার শাস্তি কী জান?"

চন্দরা কহিল, "না।"

জজসাহেব কহিলেন, "তাহার শাস্তি ফাঁসি।"

চন্দরা কহিল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি তাই দাও-না, সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।"

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন, "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো, এ তোমার কে হয়।"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল, "ও তোমাকে ভালোবাসে না?"

উত্তর। উঃ, ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাস না?

উত্তর। খুব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল ছিদাম কহিল, "আমি খুন করিয়াছি।"

প্রশ্ন। কেন।

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম, বড়োবউ ভাত দেয় নাই।

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মুর্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল, "সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

"কেন।"

"ভাত চাহিয়াছিলাম, ভাত দেয় নাই।"

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজসাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু চন্দরা পুলিস হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকিল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকালো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল সে দিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, "যাহা হউক, আমার মেয়েটির একটি সঙ্গতি করিয়া গেলাম।"

জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?"

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"

চন্দরা কহিল, "মরণ!—"

○ মূল গল্প :

রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিদার এণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, বেলেঘাটা-বেঞ্চ প্রত্যহ বিকালে খালের ধারে হওয়া খাইতে যান। চল্লিশ পার হইয়া ইনি একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছেন; সেজন্য ডাক্তারের উপদেশে হাঁটিয়া এক্সারসাইজ করেন এবং ভাত ও লুচি বর্জ্জন করিয়া দু-বেলা রুটি খাইয়া থাকেন।

কিছুক্ষণ পারচারি করিয়া বংশলোচনবাবু ক্লান্ত হইয়া খালের ধারে একটা ঢিপির উপর রুমাল বিছাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ঘড়ি দেখিলেন—সাড়ে ছটা বাজিয়া গিয়াছে জৈষ্ঠ মাসের শেষ। সিলোনে মনসুন পৌঁছিয়াছে। এখানেও যে-কোনোদিন হঠাৎ ঝড়-জল হওয়া বিচিত্র নয়। বংশোলোচন উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হাতের বর্ম্মাচুরুটে একবার জোরে টান দিলেন। এমন সময় বোধ হইল, কে যেন পিছু হইতে তাঁর জামার প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছে এবং মিহি স্বরে বলিতেছে—'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।' কিরিয়া দেখিলেন—একটি ছাগল

বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছাগল। কুচকুচে কালো নধর দেহ, বড় বড় লট্‌পটে কানের উপর কচি পটোলের মত দুটি শিং বাহির হইয়াছে। বয়স বেশী নয়, এখনো অজাতশ্মশ্রু। বংশলোচন বলিলেন—'আরে এটা কোথা থেকে এল? কার পাঁঠা? কাকেও ত দেখচি না।'

ছাগল উত্তর দিল না। কাছে ঘেঁষিয়া লোলুপনেত্রে তাঁকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বংশলোচন তার মাথায় ঠেলা দিয়ে বলিলেন—'যাঃ পালা, ভাগো হিঁয়াসে।' ছাগল পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং সাম্‌নের দু'পা মুড়িয়া ঘার বাঁকাইয়া রায়বাহাদুরকে ঢুঁ মারিল।

রায়বাহাদুর কৌতুক বোধ করিলেন। ফের ঠেলা দিলেন। ছাগল আবার খাড়া হইল এবং খপ্ করিয়া তাঁর হাত হইতে চুরুটটি কাড়িয়া লইল। আহারান্তে বলিল—'অর্-র্-র্' অর্থাৎ আর আছে?

বংশোলোচনের সিগার-কেসে আর একটিমাত্র চুরুট ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া দিলেন। ছাগলের মাথা-ঘোরা, গা-বমি বা অপর কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না। দ্বিতীয় চুরুট নিঃশেষ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'অর্-র্-র্?' বংশলোচন বলিলেন—'আর নেই। তুই এইবার যা। আমিও উঠি।'

ছাগল বিশ্বাস করিল না, পকেট তল্লাস, করিতে লাগিল। বংশোলোচন নিরুপায় হইয়া চামড়ার সিগার-কেসটি খুলিয়া ছাগলের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—'না বিশ্বাস হয়, এই দেখ্ বাপু।' ছাগল এক লম্ফে সিগার-কেস কাড়িয়া লইয়া চর্ব্বণ আরম্ভ করিল। রায়বাহাদুর রাগিবেন কি হাসিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—'শ্-শালা।'

অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। আর দেরি করা উচিত নয়। বংশলোচন গৃহাভিমুখে চলিলেন। ছাগল কিন্তু তাঁর সঙ্গ ছাড়িল না। বংশলোচন বিব্রত হইলেন। কার ছাগল কি বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না, নিকটে কোনো লোক নাই যে জিজ্ঞাসা করেন। ছাগলটাও নাছোড়বান্দা, তাড়াইলে যায় না। অগত্যা বাড়ি লইয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পথে যদি মালিকের সন্ধান পান ভালই, নতুবা কাল সকালে যা হোক একটা ব্যবস্থা করিবেন।

বাড়ি কিরিবার পথে বংশলোচন অনেক খোঁজ লইলেন কিন্তু কেহই ছাগলের ইতিবৃত্ত বলিতে পারিল না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া স্থির করিলেন যে আপাতত নিজেই উহাকে প্রতিপালন করিবেন।

হঠাৎ বংশলোচনের মনে একটা কাঁটা খচ্ করিয়া উঠিল। তার যে এখন পত্নীর সঙ্গে কলহ চলিতেছে। আজ পাঁচদিন হইল কথা বন্ধ। ইঁহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। সামান্য একটা উপলক্ষ্য, দু-চারটি নাতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, তারপর দিনকতক অহিংস-অসহযোগ, বাক্যালাপ বন্ধ, —পরিশেষে হঠাৎ একদিন সন্ধিস্থাপন ও পুনর্মিলন। এ রকম প্রায়ই হয়, বিশেষ উদ্বেগের কারণ নাই। কিন্তু আপাতত অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়। গৃহিণী জন্তু-জানোয়ার মোটেই পছন্দ করেন না। বংশলোচনের একবার কুকুর পোষার সখ হইয়াছিল। কিন্তু গৃহিণীর প্রবল আপত্তিতে তাহা সফল হয় নাই। আজ একে কলহ চলিতেছে তার উপর ছাগল লইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ।

চলিতে চলিতে রায়বাহাদুর পত্নীর সহিত কাল্পনিক বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একটা পাঁঠা পুষিলে তাতে কার কি বলিবার আছে? তাঁর কি স্বাধীনভাবে একটা সখ মিটাইবার ক্ষমতা নাই? তিনি একজন মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বেলেঘাটা রোডে তাঁর প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভূসম্পত্তি। তিনি একজন শ্বেতাবধারী অনারারি হাকিম,—পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা, একমাস পর্য্যন্ত জেল দিতে পারেন। তাঁর কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা, কিসের নারভস্‌নেস্? বংশলোচন বার-বার মনকে প্রবোধ দিলেন—তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় যে সান্ধ্য আড্ডা বসে, তাহাতে নিত্য বহুসংখ্যক রাজা-উজির বধ হইয়া থাকে। লাটসাহেব, সুরেন বাঁড়ুয্যে, মোহনবাগান, পরমার্থতত্ত্ব, প্রতিবেশী অধর-বুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কুমীর,—কোনো প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাত দিন ধরিয়া বাঘের বিষয় আলোচিত হইতে ছিল। এই সূত্রে গতকল্য বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূরসম্পর্কের ভাগিনেয় উদয়ের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। অন্যান্য সভ্য অনেক কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করেন।

বংশলোচনে বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড় ও সুসজ্জিত; অর্থাৎ অনেকগুলি ছবি, আয়ানা, আলমারি, চেয়ার ইত্যাদি জিনিষপত্রে ভর্ত্তি। প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কার্পেটে-বোনা ছবি, কালো জমির উপর আশমানী রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নীচে সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা আছে—CAT। তার নীচে রচয়িত্রীর নাম—মানিনী দেবী। ইনিই গৃহকর্ত্রী। ঘরের অপর দিকের দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের তৈল-চিত্র। কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, একটি প্রকাণ্ড সাপ তাঁহাদিগকে পাক দিয়া পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে,—কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নাই; কারণ, সাপটি বাস্তবিক সাপ নয়, ওঁ-কার মাত্র। তা-ছাড়া কতকগুলি মেমের ছবি আছে, তাদের অঙ্গে সিল্কের ব্রাহ্মণশাড়ি এবং মাথায় কালো সূতার আলুলায়িত পরচুলা ময়দার কাই দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তাদের মুখের দুরন্ত মেম-মেম ভাব ঢাকা পড়ে নাই, সেজন্য জোর করিয়া নাক বিঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরে দুটি দেওয়াল-আলমারিতে চিনামাটির পুতুল এবং কাচের খেলনা ঠাসা। উপরের শুইবার ঘরের চারটি আলমারি বোঝাই হইয়া যাহা বাড়তি হইয়াছে, তাহাই নীচে স্থান পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও নানা প্রকার আসবাব, যথা—রাজা-রাণীর ছবি, রায়বাহাদুরের পরিচিত ও অপরিচিত ছোট-বড় সাহেবের ফটোগ্রাফ, গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, আল্‌মানাক, ঘড়ি, রায়বাহাদুরের সনদ, কয়েকটি অভিনন্দন-পত্র, ইত্যাদি আছে।

আজও যথাসময়ে আড্ডা বসিয়াছে। বংশলোচন এখনো বেড়াইয়া ফেরেন নাই। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনোদ উকিল ফরাসের উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পরিতেছেন। বৃদ্ধ কেদার চাটুয্যে মহাশয় হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছেন। নগেন ও উদয় অতি কষ্টে ক্রোধ রুদ্ধ করিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, একটা ছুতা পাইলেই পরস্পরকে আক্রমণ করিবে।

আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া উদয় বলিল—'যাই বল, বাঘের মাপ কখনোই ল্যাজ-সুদ্ধু হ'তে পারে না। তা হ'লে মেয়েছেলেদের মাপও চুল-সুদ্ধু হবে না কেন? আমার বোয়ের বিনুনিটাই ত তিন ফুট হবে। তবে কি বল্‌তে চাও, বউ আট ফুট লম্বা?

নগেন বলিল—'দেখ্ উদো, তোর বোয়ের বর্ণনা আমরা মোটেই শুনতে চাই না। বাঘের কথা বল্‌তে হয় বল্।'

চাটুয্যে মহাশয়ের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বলিলেন—'আঃ হা, তোমাদের এখানে কি বাঘ ছাড়া অন্য জানোয়ার নেই?'

এমন সময় বংশলোচন ছাগল লইয়া ফিরিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন—'বাহবা, বেশ পাঁঠাটি ত। কত দিয়ে কিন্‌লে হে?'

বংশলোচন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বিনোদ বলিলেন—'বেওয়ারিস মাল, বেশী দিন ঘরে না রাখাই ভাল। সাবাড় করে ফেল,—কাল রবিবার আছে, লাগিয়ে দাও।'

চাটুয্যে মহাশয় পেট টিপিয়া বলিলেন—'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে'।

নগেন ছাগলের উরু টিপিয়া বলিল—'উঁহু, হাঁড়ি-কাবাব। একটু বেশী ক'রে আদা-বাটা আর প্যাঁজ।'

উদয় বলিল—'ওঃ, আমার বউ অ্যায়সা গুলি-কাবাব করতে জানে!'

নগেন ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—'উদো, আবার?'

বংশলোচন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'তোমাদের কি জন্তু দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে? একটা নিরীহ অনাথ প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে, তা কেবল কালিয়া আর কাবাব!'

ছাগলের সংবাদ শুনিয়া বংশোলোচনের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা টেপী এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ঘেণ্টু ছুটিয়া আসিল। ঘেণ্টু বলিল—'ও বাবা, আমি পাঁঠা খাবো। পাঁঠার ম-ম-ম—'

বংশলোচন বলিলেন—'যা যাঃ শুনে-শুনে কেবল খাই-খাই শিখছেন।'

ঘেণ্টু হাত-পা ছুড়িয়া বলিল—'হ্যাঁ, আমি ম-ম-ম মেটুলি খাবো।'

টেঁপী বলিল—'বাবা আমি পাঁঠাটাকে পুষবো একটু লালা ফিতে দাও না।'

বংশলোচন। বেশ ত একটু খাওয়া-দাওয়া করুক, তারপর নিয়ে খেলা করিস এখন।

টেঁপী। পাঁঠার নাম কি বলো না?

বিনোদ বলিলেন—'নামের ভাবনা কি। ভাসুরব, দধিমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ—'

চাটুয্যে বলিলেন—'লম্বকর্ণই ভাল।'

বংশলোচন কন্যাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'টেপু, তোর মা এখন কি করচে রে?'

টেঁপী। এক্ষুনি ত কল-ঘরে গেচে।

বংশলোচন। ঠিক জানিস্? তা হ'লে এখন এক ঘণ্টা নিশ্চিন্দি। দেখ্ ঝিকে বল্, চট্ ক'রে ঘোড়ার ভেজানো-ছোলা চাট্টি এনে এই বাইরের বারান্দায় যেন ছাগলটাকে খেতে দেয়। আর দেখ্ বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাস্‌নি যেন।

উৎসাহের অতিশয্যে টেঁপী পিতার আদেশ ভুলিয়া গেল। ছাগলের গলায় লাল ফিতা বাঁধিয়া টানিতে টানিতে অন্দর-মহলে লইয়া গিয়া বলিল—'ও মাস শীগ্‌গির এস লম্বকর্ণ দেখবে এস।'

মানিনী মুখ মুছিতে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—'আ মর্, ওটাকে কে আন্‌লে? দূর্ দূর্—ও ঝি, ও বাতাসী, শীগ্‌গির ছাগলটাকে বার করে দে, ঝাঁটা, মার্।'

টেঁপী বলিল—'বা রে, ওকে ত বাবা এনেছে, আমি পুষবো।'

ঘেণ্টু বলিল—'ঘোড়া-ঘোড়া খেলবো।'

মানিনী বলিলেন—'খেলা বার ক'রে দিচ্চি। ভদ্দর লোকে আবার ছাগল পোষে! বেরো, বেরো—ও দরওয়ান, ও চুকন্দর সিংহ—'

'হজৌর' বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল। শীর্ণ খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ, গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোঁপ, জাকালো গলা এবং ততোধিক জাকালো নাম—ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে।

অন্দরের মধ্যে হট্টগোল শুনিয়া রায়বাহাদুর বুঝিলেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য। মনে মনে তাল ঠুকিয়া বাড়ির ভিতরে আসিলেন। গৃহিণী তাঁর প্রতি দুক্‌পাত না করিয়া দরওয়ানকে বলিলেন—'ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই ত এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা করেগা।'

চুকন্দর বলিল—'বহুৎ আচ্ছা।'

বংশলোচন পাল্টা হুকুম দিলেন—'দেখো চুকন্দর সিং, এই বক্‌ড়ি গেটের বাইরে যাগা ত তোম্‌রা নোক্‌রি ভি যাগা।'

চুকন্দর বলিল—'বহুৎ আচ্ছা।'

মানিনী স্বামীর প্রতি একটি অগ্নিময় নয়নবাণ হানিয়া বলিলেন—'হ্যাঁলা টেঁপী হতচ্ছাড়ী, রাত্তির হয়ে গেল—গিল্‌তে হবে না? থাকিস্ তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায়।' গৃহিণীর পিত্রালয়।

বংশলোচন বলিলেন—'টেঁপু, ঝিকে ব'লে দে, বৈঠকখানা-ঘরে আমার শোবার বিছানা ক'রে দেবে। আর সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। আর দেখ্ ঠাকুরকে বল্ আমি মাংস খাব না। শুধু খানকতক কচুরি, একটু ডাল আর পটলভাজা।

পুরাকালে বড়লোকদের বাড়িতে একটি করিয়া গোসাঘর থাকিত। ক্রুদ্ধা আর্য্যনারীগণ সেখানে আশ্রয় লইতেন। কিন্তু আর্য্যপুত্রদের জন্য সে-রকম কোনো পাকা বন্দোবস্ত ছিল না, অগত্যা তাঁরা এক পত্নীর সহিত মতান্তর হইলে অপর এক পত্নীর দ্বারস্থ হইতেন। আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ার এইসকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর অথবা তেমন-তেমন হইলে বাপের বাড়ি। আর ভদ্রলোকদের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।

আহারান্তে বংশলোচন বৈঠকখানা-ঘরে এককী শয়ন করিলেন। অন্ধকারে তাঁর ঘুম হয় না, এজন্য ঘরের এক কোণে পিলসুজের উপর একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া বংশলোচন উঠিয়া ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বালিলেন এবং একখানি গীতা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই গীতাটি তাঁর দুঃসময়ের সম্বল,—পত্নীর সহিত অসহযোগ হইলে তিনি এটি লইয়া নাড়াচাড়া করেন এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কর্ম্মযোগ পড়িতে পড়িতে বংশলোচন ভাবিতে লাগিলেন—তিনি কী এমন অন্যায় কাজ করিয়াছেন যার জন্য মানিনী এরূপ ব্যবহার করেন? বাপের বাড়ি যাবেন,—ইস, ভারী তেজ! তিনি ফিরাইয়া আনিবার নামটি করিবেন না, যখন গরজ হইবে আপনিই ফিরিবে। গৃহিণী সখ করিয়া যে-সব জঞ্জাল ঘরে পোরেন, তা' ত বংশলোচন নীরবে বরদাস্ত করেন। এই ত সেদিন পনরটা জলচৌকি, তেইশটা বাঁটি এবং আড়াই শ টাকার খাগ্‌ড়াই বাসন কেনা হইয়াছে, আর দোষ হইল কেবল ছাগলের বেলা? হুঁঃ, যতো সব—। বংশলোচন গীতাখানি সরাইয়া রাখিয়া আলোর সুইচ্ বন্ধ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

লম্বকর্ণ বারান্দায় শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। দুটা বর্ম্মা চুরুট খাইয়া তার ঘুম চটিয়া গিয়াছে। রাত্রি একটা আন্দাজ জোরে হওয়া উঠিল। ঠাণ্ডা লাগায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বৈঠকখানা-ঘর হইতে মিট্‌মিটে আলো দেখা যাইতেছে। লম্বকর্ণ তার বন্ধন-রজ্জু চিবাইয়া কাটিয়া ফেলিল, এবং দরজা খোলা পাইয়া নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

আবার তার ক্ষুধা পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাসের এক কোণে একগোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল, অত্যন্ত নীরস। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুখাইয়া গেল। একটা উঁচু তেপায়ার উপর এক কুঁজা জল আছে, কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেড়ির তেল চাখিয়া দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চক চক করিয়া সবটা খাইল। প্রদীপ নিবিল।

বংশলোচন স্বপ্ন দেখিতেছেন—সন্ধিস্থাপন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ পাশ ফিরিতে তাঁর একটা নরম গরম স্পন্দনশীল স্পর্শ অনুভব হইল। নিদ্রা-বিজাড়িত স্বরে বলিলেন—'কখন এলে?' উত্তর পাইলেন—'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।'

হুলস্থূল কাণ্ড। চোর—চোর—বাঘ হ্যায়—এই চুকন্দর সিং—জল্দি আও—নগেন —উদো—শীগগির আয়—মেরে ফেল্লে—

চুকন্দর তার মুঙ্গেরী বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল। নগেন ও উদয় লাঠি ছাতা টেনিস ব্যাট যা পাইল তাই লইয়া ছুটিল। মানিনী ব্যাকুল হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামিয়া আসিলেন। বংশলোচন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। লম্বকর্ণ দু-এক ঘা মার খাইয়া ব্যা ব্যা করিতে লাগিল। বংশলোচন ভাবিলেন, বাঘ বরঞ্চ ছিল ভাল। মানিনী ভাবিলেন, ঠিক হয়েছে।

ভোর বেলা বংশলোচন চুকন্দরকে পাড়ায় খোঁজ লইতে বলিলেন—কোনো ভালা আদমি ছাগল পুষিতে রাজী আছে কি না। যে-সে লোককে তিনি ছাগল দিবেন না। এমন লোক চাই যে যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিবে, টাকার লোভে বেচিবে না, মাংসের লোভে মারিবে না।

আটটা বাজিয়াছে। বংশলোচন বহির্ব্বাটির বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন। নাপিত কামাইয়া দিতেছে। বিনোদবাবু ও নগেন অমৃতবাজারে ড্যালহাউসি ভার্সস্ মোহনবাগান পড়িতেছেন। উদয় ন্যাংড়া আমের দর করিতেছে। এমন সময় চুকন্দর আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—'লাটুবাবু আয়ে হেঁ।'

তিনজন সহচরের সহিত লাটুবাবু বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের বেশভূষা প্রায় একই প্রকার,—ঘাড়ের চুল আমূল ছাঁটা, মাথার উপর পর্ব্বতাকার তেড়ি, রগের কাছে দু-গোছা চুল ফণা ধরিয়া আছে। হাতে রিষ্ট-ওয়াচ, গায়ে আগুল্ফ-লম্বিত পাতলা পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাবী গেঞ্জির আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে লপেটা, কানে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট।

বংশলোচন বলিলেন—'আপনাদের কোত্থেকে আসা হচ্চে?'

লাটুবাবু বলিলেন—'আমরা বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যাণ্ড। ব্যাণ্ড-মাষ্টার লটবর লন্দ অধীন। লোক লাটুবাবু ব'লে ডাকে। শুনলুম, আপনি একটি পাঁঠা বিলিয়ে দেবেন, তাই সঠিক খবর লিতে এসেচি।'

বিনোদ বলিলেন—'আপনারা বুঝি কানেস্তারা বাজান?

লাটু। কালেস্তারা কি মশায়? দস্তুরমত কল্সাট। এই ইনি লবীন লিয়োগী ক্লারিয়লেট, —এই লরহরি লাগ ফুলোট,—এই লবকুমার লন্দন ব্যায়লা। তা ছাড়া কর্লেট, পিক্লু, হারমোনিয়া, ঢোল, করতাল সব লিয়ে উলিশজন আছি। বর্ম্মা অয়েল কোম্পানির ডিপোয় আমরা কাজ করি। ছোট-সাহেবের বিয়ের দিন যে হ'ল, ফিষ্টি দিলে, আমরা বাজালুম, সাহেব খুশী হয়ে টাইটিল দিলে—কেরাসিন ব্যাণ্ড।

বংশলোচন। দেখুন, আমার একটি ছাগল আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু—লাটু। আমরা হলুম উলিশটি প্রাণী, একটা পাঁঠায় কি হবে মশায়? কি বল হে লরহরি? নরহরি। লস্যি, লস্যি।

বংশলোচন। আমি এই সর্তে দিতে পারি যে ছাগলটিকে আপনি যত্ন ক'রে মানুষ করবেন, বেচতে পারবেন না, মারতে পারবেন না।

লাটু। এ যে আপনি নতুন কথা বলচেন মশায়। ভদ্দর লোকে কখনো ছাগল পোষে?

নরহরি। পাঁঠী নয় যে দুধ দেবে।

নবীন। পাখী নয় যে পড়বে।

নন্দকুমার। ভেড়া নয় যে কম্বল হবে।

বংশলোচন। সে যাই হোক। বাজে কথা বলবার আমার সময় নেই। নেবেন কি না বলুন।

লাটুবাবু ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন। নরহরি বলিলেন—'নিয়ে নাও হে লাটুবাবু নিয়ে নাও। ভদ্দর লোক বলচেন অত করে।'

বংশলোচন। কিন্তু মনে থাকে যেন, বেচতে পারবে না, কাটতে পারবে না।

লাটু। সে আপনি ভাববেন না। লাটু-নন্দীর কথার নড়চড় নেই।

লম্বকর্ণকে লইয়া বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যাণ্ড চলিয়া গেল। বংশলোচন বিমর্ষচিত্তে বলিলেন—'ব্যাটাদের দিয়ে ভরসা হচ্চে না।' বিনোদ আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'ভেবো না হে, তোমার পাঁঠা গন্ধর্বলোকে বাস করবে। ফাঁকে পড়লুম আমরা।'

সন্ধ্যার আড্ডা বসিয়াছে। আজও বাঘের গল্প চলিতেছে। চাটুয্যে মহাশয় বলিতেছিলেন—'সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। বাঘ ব'লে একটা ভিন্ন জানোয়ার নেই। ও একটা অবস্থার ফের, আরসোলাহ'তে যেমন কাঁচপোকা। আজই তোমরা ডারউইন্ শিখেচ,—আমাদের ওসব ছেলেবেলা থেকে জানা আছে। আমাদের রায়বাহাদুর ছাগলটা বিদেয় ক'রে খুব ভাল কাজ করেচেন। কেটে খেয়ে ফেলতেন ত কথা ছিল না, কিন্তু বাড়িতে রেখে বাড়তে দেওয়া,—উঁহু।'

বংশলোচন একখানি নূতন গীতা লইয়া নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছেন—নায়ং ভূত্বা ভবিতা না ন ভূয়ঃ, অর্থাৎ কিনা, আত্মা একবার হইয়া আর যে হইবে না। তা নয়। অজো নিত্যঃ—অজো কিনা—ছাগলং। ছাগলটা যখন বিদায় হইয়াছে, তখন আজ সন্ধিস্থাপন হইলেও হইতে পারে।

বিনোদ বংশলোচনকে বলিলেন—'হে কৌন্তেয়, তুমি শ্রীভগবানকে একটু থামিয়ে রেখে একবার চটুয্যে মশায়ের কথাটা শোনো। মনে বল পাবে।'

উদয় বলিল—'আমি সেবার যখন সিমলেয় যাই—'

নগেন। মিছে বাত বলিস্ নি উদো। তোর দৌড় আমার জানা আছে, লিলুয়া অব্‌ধি।

উদয়। বাঃ আমার দাদাশ্বশুর যে সিমলেয় থাকতেন। বউ ত সেইখানেই বড় হয়। তাই ত রং অত—

নগেন। খবরদার উদো।

চাটুয্যে। যা বলছিলুম শোনো। আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল তার নাম ভুটে। ব্যাটা খেয়ে খেয়ে হ'ল ইয়া লাস, ইয়া শিং, ইয়া দাড়ি। একদিন চরণের বাড়িতে ভোজ,—লুচি, পাঁঠার কালিয়া, এই-সব। আঁচাবার সময় দেখি, ভুটে পাঁঠার মাংস খাচ্চে। বললুম—দেখচ কি চরণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয় কর,—কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর কর, প্রাণে ভয় নেই? চরণ শুনলে না। গরিবের কথা বাসী হ'লে ফলে। তার পরদিন থেকে ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ-খোঁজ কোথা গেল। এক বচ্চর পরে মশায় সেই ছাগল সোদর-বনে পাওয়া গেল। শিং নেই বললেই হয়, দাড়ি প্রায় খ'সে গেছে, মুখ একবারে হাঁড়ি, বর্ণ হয়েচে যেন কাঁচা হলুদ, আর তার ওপর দেখা দিয়েচে মশায়—আঁজি-আঁজি ডোরা-ডোরা। ডাকা হ'ল—ভুটে, ভুটে। ভুটে বললে—হালুম্‌। লোকজন দূর থেকে নমস্কার ক'রে ফিরে এল।

'নাটুবাবু আয়ে হুঁ।'

সপারিষদ্ লাটুবাবু প্রবেশ করিলেন। লম্বকর্ণও সঙ্গে আছে বিনোদ বলিলেন—কি ব্যাপ্ত-মাষ্টার, আবার কি মনে ক'রে?

লাটুবাবুর আর সে লাবণ্য নাই। চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, চোখ বসিয়া গিয়াছে, জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সজল-নয়নে হাঁউ-মাউ করিয়া বলিলেন—'সর্ব্বনাশ হয়েচে মশায়, ধনে-প্রাণে মেরেচে। ও হোঃ হোঃ হোঃ।'

নরহরি বলিলেন—'আঃ কি কর লাটুবাবু, একটু থির হও। হুজুর যখন রয়েচেন, তখন একটা বিহিত করবেনই।'

বংশলোচন ভীত হইয়া বলিলেন—'কি হয়েচে—ব্যাপার কি?'

লাটু। মশায়, ওই পাঁঠাটা—

চাটুয্যে বলিলেন—'হুঁ, বলেছিলুম কি না?'

লাটু। ঢোলের চামড়া কেটেচে, ব্যায়লার তাঁত খেয়েচে, হারমোনিয়ার চাবি সমস্ত চিবিয়েচে। আর---আর---আমার পাঞ্জাবির পকেট কেটে লব্বই টাকার নোট---ও হো হো হো।

নরহরি। গিলে ফেলেচে। পাঁঠা নয় হুজুর, সয়তান। সর্ব্বস্ব গেছে, লাটুর প্রাণটি কেবল আপনার ভরসায় এখনো ধুক্‌পুক্ করচে।'

বংশলোচন। ফ্যাসাদে ফেললে দেখচি।

নরহরি। দোহাই হুজুর, লাটুর দশাটা একবার দেখুন, একটা ব্যবস্থা করে দিন,—বেচারা মারা যায়।

বংশলোচন ভাবিয়া বলিলেন—'একটা জোলাপ দিলে হয় না?'

লাটুবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—'মশায়, এই কি আপনার বিবেচনা হ'ল? মরচি টাকার শোকে, আর আপনি বলচেন জোলাপ খেতে?

বংশলোচন। আরে তুমি খাবে কেন,—ছাগলটাকে দিতে বলচি।

নরহরি। হায় হায়, হুজুর এখনো ছাগল চিনলেন না। কোন্ কালে হজম ক'রে ফেলেচে। লোট ত লোট,---ব্যায়লার তাঁত, ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ার চাবি, মায় ইষ্টিলের কত্তাল।

বিনোদ। লাটুবাবুর মাথাটি কেবল আস্ত রেখেচে।

বংশলোচন বলিলেন—'যা হবার তা'ত হয়েচে। এখন বিনোদ, তুমিই একটা খেসারৎ ঠিক ক'রে দাও। বেচারার লোকসান যাতে না হয়, আর আমার ওপর বেশী জুলুমও না হয়। ছাগলটা বাড়িতেই থাকুক, কাল যা হয় করা যাবে।'

অনেক দরদস্তুরের পর একশ টাকায় রফা হইল। বংশলোচন বেশী কষাকষি করিতে দিলেন না। লাটুবাবুর দল টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

লম্বকর্ণ ফিরিয়াছে শুনিয়া টেঁপী ছুটিয়া আসিল। বিনোদ বলিলেন—'ও টেঁপুরাণী, শীগ্‌গির গিয়ে তোমার মাকে বলো কাল আমরা এখানে খাবো,—লুচি, পোলাও, মাংস—'

টেঁপী। বাবা আর মাংস খায় না।

বিনোদ বলো কি! হ্যাঁ হে বংশু প্রেমটা এক পাঁঠা থেকে বিশ্ব-পাঁঠায় পৌঁছেছে না কি? আচ্ছা, তুমি না খাও, আমরা আছি। যাও ত টেঁপু। মাকে বলো সব যোগাড় করতে।

টেঁপী। সে এখন হচ্ছে না। মা-বাবার ঝগড়া চলচে, কথাটি নেই।

বংশলোচন ধমক দিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ—কথাটি নেই,—তুই সব জানিস, যা যাঃ, ভারি জ্যাঠা হয়েচিস।'

টেঁপী। বা-রে, আমি বুঝি কিছু টের পাই না? তবে কেন মা খালি-খালি আমাকে বলে—টেঁপী পাখাটা মেরামত করাতে হবে—টেঁপী, এমাসে আরও দু শ টাকা চাই বলে না কেন?

বংশলোচন। থাম্ থাম্, বকিস্‌নি।

বিনোদ। হে রায়বাহাদুর, কন্যাকে বেশী ঘাঁটিও না, অনেক কথা ফাঁস ক'রে দেবে। অকস্মাৎ সন্ধিন হয়েচে বলো?

বংশলোচন। আরে এতদিন ত সব মিটে যেত, ঐ ছাগলটাই মুস্কিল বাধালে।

বিনোদ। ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষণ। তোমারই বা অত মায়া কেন? খেতে না পার বিদেয় ক'রে দাও। জলে বাস করে, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কোরো না।

বংশলোচন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'দেখি কাল যা হয় করা যাবে।'

এ রাত্রিও বংশলোচন বৈঠকখানায় বিরহ-শয়নে যাপন করিলেন। ছাগলটা আস্তাবলে বাঁধা ছিল, উপদ্রব করিবার সুবিধা পায় নাই।

পরদিন বৈকাল সাড়ে পাঁচটার সময় বংশলোচন বেড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কেহ তাঁকে লক্ষ্য করিতেছে কি না। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা উপরে আছে। ঝি-চাকর অন্তরে কাজকর্ম্মে ব্যস্ত। চুকন্দর সিং তার ঘরে বসিয়া আটা সানিতেছে। লম্বকর্ণ আস্তাবলের কাছে বাঁধা আছে এবং দড়ির সীমার মধ্যে যথাসম্ভব লম্ফঝম্ফ করিতেছে। বংশলোচন দড়ি হাতে করিয়া ছাগলকে লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলেন।

পাশে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় সেজন্য বংশলোচন সোজা রাস্তায় না গিয়া গলি-ঘুঁজির ভিতর দিয়া চলিলেন। পথে এক ঠোঙা জিলিপি কিনিয়া পকেটে রাখিলেন। ক্রমে লোকালয় হইতে দূরে আসিয়া জনশূন্য খাল-পারে পৌঁছিলেন।

আজ তিনি স্বহস্তে, লম্বকর্ণকে বিসর্জ্জন দিবেন, যেখানে পাইয়াছিলেন আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিবেন,—যা থাকে তার কপালে। যথাস্থানে আসিয়া বংশলোচন জিলিপির ঠোঙাটি ছাগলকে খাইতে দিলেন। পকেট হইতে এক টুকরো কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে লিখিলেন—

এই ছাগল বেলেঘাটা খালের ধারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা কালি যীশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।

লেখার পর কাগজ ভাঁজ করিয়া একটা ছোট টিনের কৌটায় ভরিয়া লম্বকর্ণের গলায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তারপর বংশলোচন শেষবার ছাগলের গায়ে হাত বুলাইয়া অস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণ তখন আহারে ব্যস্ত।

দূরে আসিয়াও বংশলোচন বার-বার পিছু ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লম্বকর্ণ আহার শেষ করিয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছে। যদি তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে এখনি পশ্চাদ্ধাবন করিবে। এদিকে আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। বংশলোচন জোরে জোরে চলিতে লাগিলেন।

আর পারা যায় না, হাঁফ ধরিতেছে। পথের ধারে একটা তেঁতুল গাছের তলায় বংশলোচন বসিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণকে আর দেখা যায় না। এইবার তাঁর মুক্তি,—আর কিছুদিন দেরি করিলে জড়ভরতের অবস্থা হইত। ঐ হতভাগা কৃষ্ণের জীবকে আশ্রয় দিতে গিয়া তিনি নাকাল হইয়াছেন। গৃহিণী তার উপর মর্ম্মান্তিক রুষ্ট, আত্মীয়স্বজন তাকে খাইবার জন্য হাঁ করিয়া আছে,—তিনি একা কাঁহাতক সামলাইবেন? হায় রে সত্যযুগ, যখন শিবিরাজা শরণাগত কপোতের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন, —মহিষীর ক্রোধ, সভাসদ্‌বর্গের বেয়াদবি, কিছুই তাঁকে ভোগ করিতে হয় নাই।

দ্রুম্ দুম্‌দুড় দুড় দড়ড়ড় ড়। আকাশে কে ঢেঁটরা পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষের গম্বুজে এক পোঁচ সীসা-রঙের অস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পলাইতেছে। সমস্ত চুপ,—গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। আসন্ন

দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন উঠিলেন, কিন্তু আবার বসিয়া পড়িলেন। জোরে হাঁটার ফলে তাঁর বুক ধড়ফড় করিতেছিল।

সহসা আকাশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক ঝলক বিদ্যুৎ—কড় কড় কড়াৎ,—ফাটা আকাশ আবার বেমালুম জুড়িয়া গেল। ঈশানকোণ হইতে একটা ঝাপসা পর্দ্দা তাড়া করিয়া আসিতেছে। তার পিছনে যা কিছু সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আর দেরি নাই। ঐ এল, ঐ এল। গাছপালা শিহরিয়া উঠিল। লম্বা-লম্বা তালগাছগুলা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্ত্তনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপটা খাইয়া আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড ঝড়, প্রচণ্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগণ্য উইটিবি,—এই ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরকে ডুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা সার বাঁধিয়া বড়-বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, তার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা। সমস্ত শূন্য ভরাট হইয়া গিয়াছে।

মান-ইজ্জৎ কাপড়-চোপড় সবই গিয়াছে, এখন প্রাণটা রক্ষা পাইলে হয়। হা রে হতভাগা ছাগল, কি কুক্ষণে—

বংশলোচনের চোখের সামনে একটা উগ্র বেগুনী আলো খেলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সঞ্চিত বিশ কোটি ভোল্ট্ ইলেকট্রিসিটি অদূরবর্ত্তী একটা নারিকেল গাছের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিকট নাদে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

রাশি রাশি সরিষার ফুল। জগৎ লুপ্ত, তুমি নাই, আমি নাই। বংশলোচন সংজ্ঞা হারাইয়াছেন।

* * *

বৃষ্টি থামিয়াছে কিন্তু এখনো সো সো করিয়া হাওয়া চলিতেছে। ছেঁড়া মেঘের পর্দ্দা ঠেলিয়া দেবতারা দু-চারটা মিট্‌মিটে তারার লণ্ঠন লইয়া নীচের অবস্থা তদারক করিতেছেন।

বংশলোচন কর্দ্দম-শয্যায় শুইয়া ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি কে? রায়বাহাদুর কোথায়? খালের নিকট। ও কিসের শব্দ? সোনা-ব্যাং। তাঁর নষ্টস্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। ছাগলটা?

মনুষ্যের স্বর কানে আসিতেছে। কে তাঁকে ডাকিতেছে? 'মামা—জামাইবাবু—বংশু আছ?—হজৌর—'

অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। জনকতক লোক লণ্ঠন লইয়া ইতস্তত ঘুরিতেছে এবং তাঁকে ডাকিতেছে। একটি পরিচিত নারীকণ্ঠে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল।

রায়বাহাদুর চাঙ্গা হইয়া বলিলেন—'এই যে আমি এখনে আছি—ভয় নেই—'

* * *

মানিনী বলিলেন—'আজ আর দোতলায় উঠে কাজ নেই। ও ঝি, এই বৈঠকখানা-ঘরেই বড় ক'রে বিছানা ক'রে দে ত। আর দেখ্ আমার বালিশটাও দিয়ে যা। আঃ, চাটুয্যে মিন্‌সে নড়ে না। ও কি—সে হবে না,—এই গরম লুচি ক'খানি খেতেই হবে, মাথা.....। তোমার সেই বোতলটায় কি আছে—তাই একটু চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব নাকি?'

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—

বংশলোচন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'অ্যাঁ ওঠা আবার এসেচে? নিয়ে আয় ত লাঠিটা—'

মানিনী বলিলেন,—'আহা করো কি, মেরো না। ও বেচারা বৃষ্টি থামতেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েচে। তাইতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ওঃ হরি মধুসূদন।'

লম্বকর্ণ বাড়িতেই রহিয়া গেল, এবং দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল, ক্রমে তার হাত দাড়ি গজাইল। রায়বাহাদুর আর বড়-একটা খোঁজ-খবর করেন না, তিনি এখন ইলেকশন্ লইয়া ব্যস্ত। মানিনী লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। তার জন্য সাবান ও কিনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। লোকে দূর হইতে তাকে বিদ্রূপ করে।

লক্ষ্মণ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া যায়,—নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে—ব-ব-ব—অর্থাৎ যত ইচ্ছা হয় বকিয়া যাও, আমি ও-সব গ্রাহ্য করি না।